بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ২১ জুলাই, ২০২৩ তারিখে লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় বদরের যুদ্ধবন্দিদের সাথে উত্তম আচরণ, যুদ্ধবিজয়ের প্রভাব এবং বদরী সাহাবীদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করেন।

তাশাহ্হুদ, তাআউয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন, বদরের যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিত বর্ণনা করা হচ্ছে। আজ এ বিষয়ে আরো কিছু উল্লেখ করা হবে। **বদরের যুদ্ধের পরিসমাপ্তিতে যুদ্ধবিন্দদের সাথে মহানবী (সা.)-এর সদয় আচরণের** বিষয়ে তাবাকাত ইবনে সা'দে লিপিবদ্ধ আছে, যুদ্ধবন্দিদের মাঝে মহানবী (সা.)-এর চাচা হযরত আব্বাসও ছিলেন। তিনি (সা.) সেই রাতে কষ্টের কারণে জাগ্রত ছিলেন। জনৈক সাহাবী জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি কেন বিনিদ্র রাত কাটাচ্ছেন? তিনি (সা.) বলেন, আব্বাসের গোঙ্গানোর কারণে আমার ঘুমাতে কষ্ট হচ্ছে। এটি অনুধাবন একজন সাহাবী আব্বাসের হাতের বাঁধন আলগা করে দেন। রসূলুল্লাহ্ (সা.) এটি বুঝতে পেরে বলেন, কি ব্যাপার! আব্বাসের গোঙ্গানোর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না কেন? তিনি বলেন, তার হাতের বাঁধন কিছুটা আলগা করে দেয়া হয়েছে। অতঃপর মহানবী (সা.) বলেন, এটি হতে পারে না যে, স্বজন প্রীতির কারণে আব্বাসের বাঁধন আলগা করে দেয়া হবে আর অন্য সব বন্দির বাঁধন শক্ত থাকবে। যদি আব্বাসের বাঁধন আলগা করে দেয়া হয় তাহলে সকল বন্দির বাঁধনই আলগা করে দাও।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ (রা.) তাঁর সীরাত খাতামান্ নবীঈন পুস্তকে লিখেছেন, মহানবী (সা.) মুসলমানদেরকে বন্দিদের সাথে কোমল ও স্নেহপূর্ণ ব্যবহারের তাগিদ দিয়েছেন। সাহাবীরা যারা মহানবী (সা.)-এর প্রতিটি নির্দেশ পালনের জন্য সীমাহীন উদগ্রীব থাকতেন তারা এই তাগিদের ওপর এরূপ আন্তরিকতার সাথে আমল করেছেন যে, পৃথিবীর ইতিহাসে যার কোনো তুলনা পাওয়া যায় না। **প্রাচ্যবিদ স্যার উইলিয়াম মুইরও** বন্দিদের সাথে মুসলমানদের উত্তম আচরণের স্বীকারোক্তি প্রদান করে বলেছেন, মুহাম্মদ (সা.)-এর নির্দেশ অনুসারে আনসার ও মুহাজিররা কাফির বন্দিদের সাথে অত্যন্ত দয়া ও প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করেছেন। এছাড়া অনেক বন্দির নিজেদের এই স্বীকারোক্তি ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ আছে যে, তারা বলতেন, **খোদা তা'লা মদীনাবাসীর মঙ্গল করুন! তারা আমাদেরকে বাহনে চড়াতেন, অথচ নিজেরা পায়ে হেঁটে চলতেন। আমাদেরকে গমের রুটি খেতে দিতেন আর নিজেরা কেবল খেজুর খেয়ে দিনাতিপাত করতেন।** অতএব এটি শুনে আমাদের আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে, অনেক বন্দি এরূপ সদয় ব্যবহারের কারণে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল আর এরপর সেসব লোককে তাৎক্ষণিকভাবে মুক্ত করে দেয়া হয়েছিল। এছাড়া যেসব বন্দি ইসলাম গ্রহণ করেনি তাদের ওপরও এই উত্তম আচরণের অনেক গভীর প্রভাব পড়েছিল।

এরপর হুযূর (আই.) বলেন, **বদরের যুদ্ধ পরবর্তী প্রভাব** সম্পর্কে লিপিবদ্ধ আছে, যুদ্ধে বিজয়ের সুসংবাদ নিয়ে যখন আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা এবং যায়েদ বিন হারেসা (রা.) মদীনায় পৌঁছেন তখন ইসলামের শত্রু কা'ব বিন আশরাফ সেই সংবাদকে মিথ্যা আখ্যা দিয়ে বলতে থাকে, যদি মুহাম্মদ (সা.) এই বড় বড় নেতাদের হত্যা করে থাকেন তাহলে ভুপৃষ্ঠে থাকার চেয়ে ভুগর্ভে ঢুকে যাওয়াই উত্তম অর্থাৎ জীবিত থাকার চেয়ে মরে যাওয়াই শ্রেয়।

আল্লামা শিবলী নোমানী তার পুস্তকে বদরের যুদ্ধের পরিণাম উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেছেন, বদরের যুদ্ধের ফলাফল কাফিরদের ধর্মীয় এবং দেশীয় পরিস্থিতির ওপর পালাক্রমে প্রভাব সৃষ্টি করেছিল আর প্রকৃত অর্থে ইসলাম উন্নতির পথে একধাপ এগিয়ে গিয়েছিল। কুরাইশের সমস্ত বড় বড় নেতা যাদের একেকজন ইসলামের উন্নতির পথে ইস্পাতসম প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছিল তারা এই যুদ্ধে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। উতবা এবং আবু জাহলের মৃত্যুর পর কুরাইশের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মুকুট আবু সুফিয়ানের মাথায় পড়ানো হয়, যার ফলে উমাইয়্যা রাজত্বের নবসূচনা তো হয়েছিল বটে, কিন্তু কুরাইশের শক্তি ও ক্ষমতা প্রকৃত অর্থে অনেকটাই হ্রাস পেয়েছিল। মদীনায় তখনও পর্যন্ত আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূল প্রকাশ্যে কাফির ছিল, কিন্তু এই যুদ্ধের পর সে বাহ্যত ইসলাম অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। অর্থাৎ বদরের যুদ্ধের পর সে বাহ্যত ইসলাম গ্রহণ করেছিল; কিন্তু সে আজীবন মুনাফিক ছিল এবং এ অবস্থায়ই প্রাণ ত্যাগ করে। আরব গোত্রগুলো এসব ঘটনা দেখে অনুগত না হলেও ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ (রা.) বলেন, বদরের যুদ্ধের প্রভাব মুসলমান, কাফির সবার ওপর দীর্ঘস্থায়ীভাবে পড়েছিল আর তাই ইসলামের ইতিহাসে এর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এ কারণেই পবিত্র কুরআনে এ যুদ্ধের নাম **ইয়াওমুল ফুরকান** রাখা হয়েছে যার অর্থ এটি সেই দিন যেদিন ইসলাম ও কুফরের মাঝে এক সুস্পষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়েছে। বদরের যুদ্ধের পরও কুরাইশ ও মুসলমানদের মাঝে বড় বড় যুদ্ধ ও লড়াই হয়েছে এবং মুসলমানদের ওপর বড় বড় বিপদ এসেছে, কিন্তু এ যুদ্ধের পর মক্কার কাফিরদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গিয়েছিল, পরবর্তীতে স্থায়ীভাবে যার ক্ষতিপূরণ আর কখনোই হয়নি। এখানে প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, নিহতদের সংখ্যার দিক দিয়ে এটি বড় কোনো পরাজয় ছিল না। কুরাইশ জাতিতে ৭০-৭২জনের নিহত হওয়াকে কখনো জাতির মূলোৎপাটন বলা যায় না, তাহলে এটিকে **ইয়াওমুল ফুরকান** কেন বলা হলো? এর সমুচিত জবাব পবিত্র কুরআন এভাবে দিয়েছে যে, يَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ অর্থাৎ সেদিন কাফিরদের মূলোৎপাটন করা হয়েছিল অর্থাৎ সেদিন কুরাইশের মূলোৎপাটন করা হয়েছিল। কেননা কুরাইশের নেতা শায়বা, উতবা, উমাইয়্যা বিন খালাফ, আবু জাহল, উকবা সবাই তাদের জাতীয় নেতা ছিল। যেহেতু তাদের প্রাণভোমরাদের অধিকাংশ নিহত হয়েছিল তাই এটিকে ইয়াওমুল ফুরকান আখ্যা দেয়া হয়েছে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এ সম্পর্কে লিখেছেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, মুসলমানদের ওপর এরপরও অনবরত অত্যাচার হচ্ছিল এবং তাদেরকে কাফিরদের সাথে লড়াই

করতে হয়েছে, কিন্তু নিঃসন্দেহে বদরের যুদ্ধে কাফিরদের মূল শক্তি ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল এবং মুসলমানদের প্রভাব-প্রতিপত্তি তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

এরপর হুযূর (আই.) **বদরের সাহাবীদের শ্রেষ্ঠত্ব** সম্পর্কে উল্লেখ করে বলেন, বর্ণিত আছে, জীব্রাঈল (আ.) মহানবী (সা.)-এর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুসলমানদের তিনি কী পদমর্যাদা দেবেন? মহানবী (সা.) বলেন, তারা হবেন মুসলমানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তখন জীব্রাঈল উত্তর দেন, বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ফিরিশ্তারাও শ্রেষ্ঠ হবেন। **হযরত আবু হুরায়রা** (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা বদরে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি দিয়েছেন এবং বলেছেন, তোমরা যা চাও করো আমি তোমাদের পূর্বাপর সকল পাপ ক্ষমা করে দিয়েছি অর্থাৎ, কুফরী অবস্থা ব্যতিরেকে তাদের সাধারণ দোষত্রুটি ও পাপ আল্লাহ্ তা'লা ক্ষমা করে দিবেন। হুযুর (আই.) এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বলেন, এখানে আল্লাহ্ তা'লা তাদের বিষয়ে নিশ্চয়তাও দিচ্ছেন যে, তাঁদের ওপর কখনো কুফরী অবস্থা আসবে না এবং তাঁদের পরিণাম উত্তম হবে। এছাড়া একথার আরেকটি অর্থ হলো, তাঁরা যদি সামান্য কোনো দোষ বা পাপ করে ফেলে অর্থাৎ মানবীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে গেলেও আল্লাহ্ তাঁদেরকে ক্ষমা করে দিবেন।

হযরত উমর (রা.)'র যুগে যখন সাহাবীদের ভাতা নির্ধারণ করা হয়েছিল তখন বদরী সাহাবীদের বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। অধিকন্তু বদরী সাহাবীরা নিজেরাও এ যুদ্ধে অংশ নেয়ার কারণে গর্ববোধ করতেন। বদরী সাহাবীদের গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়টি এর মাধ্যমেও বুঝা যায় যে, মহানবী (সা.) এ উম্মতে আগমনকারী মাহদীর এ লক্ষণ উল্লেখ করেছেন যে, **তার কাছে একটি ছাপানো পুস্তক থাকবে, যেখানে বদরী সাহাবীদের সংখ্যানুযায়ী তাঁর ৩১৩জন সাহাবীর নাম লিপিবদ্ধ থাকবে।** হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এরূপ একটি রেজিস্টার প্রস্তুত করে তাতে তাঁর ৩১৩জন সাহাবীর নাম লিপিবদ্ধ করেছেন যার মাধ্যমে এ ভবিষ্যদ্বাণী আক্ষরিক অর্থেও পূর্ণ হয়েছে। **শেখ আলী হামযা বিন আলী** তার পুস্তক জাওয়াহেরুল আসরারে লিখেছেন, মাহদী সেই গ্রাম থেকে আত্মপ্রকাশ করবেন যার নাম হবে কাদেয়া (কাদিয়ান নামটি কালের পরিক্রমায় এসেছে)। তিনি আরো বলেন, খোদা তা'লা সেই মাহদীকে সত্যায়ন করেছেন এভাবে যে, দূরদূরান্তে তার অনুসারী থাকবে যাদের সংখ্যা বদরী সাহাবীদের সংখ্যার ন্যায় হবে অর্থাৎ ৩১৩জন হবে এবং তাদের নাম, ঠিকানা ও বৈশিষ্ট্যাবলী সেই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হবে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, পূর্বে কোনো মাহদী দাবিকারকের এ সুযোগ হয়নি যে, তার কাছে পুস্তক ছাপানোর উপকরণ ছিল, যাতে সে তাঁর সাথীদের নাম লিপিবদ্ধ করবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর পুস্তক খুতবায়ে ইলহামিয়্যায় **বদর এবং চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝে একটি সুক্ষ্ম সাদৃশ্য** বর্ণনা করে বলেন, এখন এই চতুর্দশ শতাব্দীতে সেই একই অবস্থা পরিলক্ষিত হচ্ছে যা বদরের যুদ্ধের দিন হয়েছিল যার দরুন আল্লাহ্ তা'লা বলছেন, **وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ**। এই আয়াতেও মূলত একটি ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত ছিল অর্থাৎ চতুর্দশ শতাব্দীতে যখন ইসলাম দুর্বল ও

অসহায় হয়ে পড়বে তখন সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থে তিনি তাঁকে সাহায্য করবেন। তিনি (আ.) বলেন, এখন দেখো! সাহাবীদেরকে বদরের দিন সাহায্য করা হয়েছে আর বলা হয়েছে, এই সাহায্য তখন করা হয়েছে যখন তোমরা সংখ্যায় স্বল্প ছিলে। সেই বদরে কাফিররা নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। বদরের দিন এরূপ মহান নিদর্শন প্রদর্শনের মাধ্যমে ভবিষ্যতের জন্য যে সংবাদ প্রদান করা হয়েছিল তা হলো, **বদর চতুর্দশীর চাঁদ বা পূর্ণিমার চাঁদকে বলা হয়ে থাকে। এদ্বারা চতুর্দশ শতাব্দীতে আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য প্রকাশিত হবার প্রতিও দিক-নির্দেশ করে।**

খুতবায়ে সানীয়ার পূর্বে হুযূর (আই.) বলেন, এখন আমি আসন্ন যুক্তরাজ্যের বার্ষিক জলসা সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। ইনশাআল্লাহ্ আগামী শুক্রবার থেকে ইউকে'র বার্ষিক জলসা শুরু হতে যাচ্ছে। এবার তিন চার বছর পর বহির্বিশ্ব থেকেও অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে অতিথিরা এখানে আসবেন, বরং অতিথিদের আগমন শুরু হয়ে গেছে। আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক সফরকারীর সফর নিরাপদ ও আনন্দময় করুন এবং সবাই এখানে এসে জলসার মাধ্যমে প্রকৃত অর্থে কল্যাণমণ্ডিত হোন। অনুরূপভাবে যুক্তরাজ্য জামাতের সদস্যরাও যথাযথ উদ্যম ও প্রেরণা নিয়ে জলসায় অংশগ্রহণ করুন আর কেবলমাত্র এ বিষয়টি দৃষ্টিপটে রাখুন যে, জলসার দিনগুলোতে আমরা আমাদের আধ্যাত্মিক মানকে উঁচু করার সর্বাত্মক চেষ্টা করব। পরিশেষে হুযূর (আই.) জলসার সকল কর্মি ও অতিথিদের বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা প্রদান করে বলেন, জলসায় অংশগ্রহণকারীরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অতিথি। প্রত্যেককে মহানবী (সা.) এ উপদেশের প্রতি আমল করা উচিত যে, সর্বদা হাস্যজ্জ্বল থাকবেন। মহানবী (সা.) এও বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে সে যেন অতিথির সন্মান করে। আল্লাহ্ তা'লা সকল কর্মকর্তা ও কর্মিকে উত্তমরূপে নিজেদের দায়িত্ব পালনের তৌফিক দিন, জলসা সবদিক থেকে কল্যাণমণ্ডিত করুন। বিশেষভাবে আহমদীদেরকে এ জলসার সার্বিক সফলতার জন্য দোয়া করতে থাকা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে এর তৌফিক দিন, (আমীন)

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org -এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)